International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-II, March 2023, Page No.09-17
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i2.2023.09-17

ঔপনিবেশিকতা, বাঙালি মেয়েদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় বাঙালি মহিলা চিকিৎসকরা

সুতপা মুখোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কিশোর ভারতী ভাগিনী নিবেদিতা কলেজ, কলকাতা, ভারত

Abstract:
In the colonial Bengal of 19th century the concept of women's education gained ground and with that the consciousness of women's health took place in Bengal society. Coming of western medical science contributed for the institutional medical treatment in Bengal and women's health centred round the reproductive health. It was thought that female doctors were necessary for the treatment of female patients because of the practice of purdah. Generally, women were handled by the dais during the time of child-birth. Those dais were criticised both by the colonial government and the newly educated Bengali middle class society as the dais were considered as uneducated and unhygienic who were responsible for the misery of the mother and child. The Bengali society was in dual mind regarding the medical education for the women. The conservative section of the society did not accept the necessity of making lady doctors. But the progressive people of the society like the Brahmo leaders were vocal about the medical education of the Bengali women. After several debates through decades, the door of the Calcutta Medical College was open for the female students. In the year 1883, Kadambini Ganguly entered the Calcutta Medical College as its first female student. Vernacular medical classes started in The Campbell Medical School with fifteen students in the year 1888. Several Medical Schools surfaced in the later decades. Medical Students of the colonial Bengal faced many difficulties in their professional life. Yet, they tried to overcome the hurdles for the welfare of the society.
Key Words: Colonial, Medical, Female Doctor, Bengali society, Reproductive health

মেয়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে আলোচনা উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা সচেতন শিক্ষিত বাঙালি সমাজে শুরু হয়েছিল তা প্রধানত ছিল প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলোচনা। বাঙালি সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার সূচনায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থা বাঙালি জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। সেই চিকিৎসা মূলত পুরুষকেন্দ্রিক হলেও, ক্রমশ মেয়েদের স্বাস্থ্যও সেই প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে স্থান করে নিতে থাকে। তার একটা কারণ ঔপনিবেশিকতা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পিছিয়ে পড়ার যে ধারণা সামনে নিয়ে আসছিল তার কারণ হিসেবে মূলত চিহ্নিত হচ্ছিল ভারতীয় মেয়েদের সমাজনির্ধারিত ব্যবস্থার ফলে পিছিয়ে পড়া। নব্যশিক্ষিত ভারতীয় বাঙালি সমাজ সেই অপবাদ থেকে মুক্তি বা নিজেদের অগ্রবর্তিতার নিদর্শনস্বরূপ এবং

আত্মসচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীশিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীস্বাস্থ্যের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষায় যে প্রাতিষ্ঠানিকতার কথা ভাবা হয়েছিল, সেখানে মেয়েদের দ্বারা মেয়েদের চিকিৎসার ধারণাটির উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। তাই, পর্দানশিন হিন্দু সমাজে মহিলা চিকিৎসক তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল মহিলা রোগীদের জন্য। মেয়েরা যে জন্মগতভাবে আর্তের সেবার জন্য প্রস্তুত এমন ধারণার কোন অভাব ছিল না দেশীয় মননে। বামাবোধিনী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১২৯৩) রমণীর কর্তব্য হিসেবে পীড়িতের শুশ্রূষার কথা বলা আছে এই ভাবে, 'অতি অল্প দিবস পূর্বে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সকলেই নানাপ্রকার পীড়ার কিছু কিছু ঔষধ জানিতেন, এখনও মফঃস্বলের এবং শহরের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগকে বালক বালিকাগণের সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা করিতে দেখা যায়। এটী তাঁহাদের সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় একটি শিক্ষণীয় কার্য্য ছিল। বাটীর মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে প্রথমে চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গৃহিণীরা তাঁহাদের শিক্ষিত ঔষধ দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেন এবং অনেক স্থলে তাহার সুফলও দেখা গিয়াছে।'[১] গৃহচিকিৎসার গন্ডি থেকে বেরিয়ে মেয়েদের এই যে নতুন ভূমিকার একটা ধারণা যে সমাজকে খুব স্বস্তি দিয়েছিল তেমনটা নয়। আবার মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তাকেও সমর্থন করেছিল শিক্ষিত শ্রেণির একাংশ। ফলত, নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের মেডিক্যাল পড়ার বিষয়টি অগ্রসর হয়েছিল।

বাঙালি রক্ষনশীল সমাজ মেয়েদের চিকিৎসার জন্য মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে চিকিৎসক হয়ে ওঠার ধারণাটিকে নস্যাত করেছিল যার একটা ছবি পাওয়া যায় রক্ষণশীল সংবাদপত্র *নববিভাবরী সাধারণী* থেকে। পত্রিকাটি বলেছিল, মহিলা চিকিৎসকের অভাবে মেয়েরা মরে যায়নি। বেশিরভাগ দেশেই মহিলারা জনসংখ্যার দিক থেকে পুরুষের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। চিকিৎসার অভাবে মেয়েরা মারা গেলে সেটা সম্ভব হত না।[২] কিন্তু, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী এবং ভারতীয় সমাজসংস্কারকরা মেয়েদের পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ভারতীয়দের জন্য চিকিৎসাবিদ্যার পঠনপাঠন শুরু হয় প্রধানত ইউরোপীয় সার্জেনদের সহকারী হিসেবে কয়েকজনকে তৈরি করার উদ্দেশ্যে। এঁরা অভিহিত হতেন 'নেটিভ ড্রেসার্স', 'কান্ট্রি ডক্টর্স' প্রভৃতি নামে। ১৮১৩র চার্টার অ্যাক্ট নেটিভ ডক্টর্স তৈরির বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। এই নেটিভ ডক্টর্সরা সৈন্যদের চিকিৎসার পাশাপাশি সিভিল হাসপাতালেও চিকিৎসার সুযোগ পেতেন। তবে এঁরা প্রধানত ইউরোপীয় ডাক্তারদের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।[৩] ১৮২৮ সালে গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে শাসনের ধারণাটি কার্যকরী হয়। ভারতের পশ্চাদপদতা এবং ব্রিটিশ শাসনের আধুনিকতা যা ভারতীয় অন্ধকার সমাজকে আলো দেখায় তাই ছিল উদারনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষে যুক্তি। বাংলায় পূর্বতন নেটিভ স্কুল ফর ডক্টর্সের অবলুপ্তি ঘটিয়ে একটি হাসপাতাল গঠনের কথা ভাবা হয়।[৪] ১৮৩৫ সালে গড়ে ওঠে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ। উপনিবেশের মানুষকে পাশ্চাত্য চিকিৎসার আওতায় নিয়ে এসে ঔপনিবেশিক সমাজে নিজেদের ভূমিকার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করার প্রয়াস ছিল শাসকের। আধুনিকতার অন্যতম শর্ত হিসেবে মহিলাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার কাজটিতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল মিশনারি ও শ্বেতাঙ্গিনীদের। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছিল মেয়েদের শরীর স্বাস্থ্যের বিষয়টি। মেয়েদের জন্য মেয়ে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তার ধারণা বাড়িয়ে দিয়েছিল মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব।

দেশীয় মনন এবং শাসকের দৃষ্টিভঙ্গিতে মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান হেতু ছিল মাতৃত্ব। মেয়েদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রটিতে যে পরিবর্তনের কথা ভাবা হয়েছিল তা মূলত ছিল প্রসবসংক্রান্ত। সমালোচিত হয়েছিল অশিক্ষিত ধাত্রীর হাতে সন্তানপ্রসবের বিষয়টি এবং মা ও নবজাতকের জন্য যে সূতিকাগৃহের বন্দোবস্ত সেটি। প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল এইসব চলে আসা ব্যবস্থা যা বাঙালির নব্য চেতনায় গড়ে ওঠা জাতীয় স্বাস্থ্যের ধারণার সঙ্গে একেবারেই বেমানান ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে জন্মদান প্রক্রিয়ার চিকিৎসায়নের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান জায়গা ছিল। একটি হল জন্মদানের জন্যে নতুন পদ্ধতি এবং অপরটি হল জন্মদান প্রক্রিয়া দেখাশোনার জন্যে যারা ছিল তাদের পরিবর্তন। প্রকৃত অর্থে দেশীয় ধাত্রী বা দাই-এর প্রান্তিকীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা চিকিৎসক আনয়নের জন্যে। গার্হস্থ্যের নবতর ধারণায় শিশুমৃত্যু মধ্যবিত্ত জীবনে যে উদ্‌বেগ নিয়ে আসছিল তা গর্ভধারণ ও শিশুর জন্মদান প্রক্রিয়া বিষয়ে সচেতনতা নিয়ে আসছিল। ভারতের অন্যান্য জায়গার মতো বাংলাতেও বহুকাল থেকে ধাত্রী বা দাইরা জন্মদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পেশাগত পরম্পরায় তারা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা গর্ভবতী মহিলার যত্ন ও প্রসব কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির ধারণার উপর প্রশ্ন তোলা হয়। এই পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির বিষয়টি উত্থাপিত হয় মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও। প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রথম সমালোচনাটি হয় দাইকে কেন্দ্র করে। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় ইউরোপীয় মিশনারিরা বাংলায় উচ্চহারে মা ও শিশুর মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং প্রচলিত প্রসবকালীন প্রথাকে দায়ী করেন। তবে বাঙালি মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ এই সময়ে শুরু হয়নি। ভারতীয় গার্হস্থ্য বিষয়ে অনুপ্রবেশে তখনও কিছু দ্বিধা ছিল ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। Supriya Guha তাঁর 'The Best Swadeshi: Reproductive Health in Bengal, 1840-1940'-এ জানাচ্ছেন যে ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটেনে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং দেশীয় মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর দাবির ফলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নতুন চিকিৎসার ক্ষেত্র গড়ে ওঠে।[৫] ১৮৪১ সালে ধাত্রীবিদ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা খুলে দিয়েছিল নতুন দিগন্ত। ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে এই কলেজ নতুন করে ভাবার উপাদান জুগিয়েছিল। শুরু থেকেই ধাত্রীবিদ্যা পড়ানোর যে ধারা চলল তাতে মনে হয় এই বিষয়ে একটা দৃষ্টিভঙ্গির স্বল্প পরিবর্তন আসছিল দেশীয় সমাজে। ১৮৩৭ সালে চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা টাউন হলের বক্তৃতায় বলেন যে "প্রসবকালে মহিলারা যথেষ্ট যন্ত্রণায় ভোগেন, বিশেষ করে অল্পবয়সী মায়েরা।"[৬] তিনি বলেন প্রসবকালীন সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করার উপায় হল প্রথম থেকেই দক্ষ চিকিৎসক বা ধাত্রীর পরামর্শ মেনে চলা। ধাত্রীবিদ্যা ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্বপুর্ন হয়ে ওঠে।

ভারতীয় মেয়েদের চিকিৎসার জন্য মিশনারিদের নেওয়া উদ্যোগের পর ১৬৮৫ সালে ডাফরিন ফান্ডের প্রতিষ্ঠা মেয়েদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একটি জলবিভাজিকা ছিল। পুরুষ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণে অপারগ ভারতীয় মেয়েদের জন্য চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়া ডাফরিন ফান্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সমালোচনা করা হয়েছিল অশিক্ষিত দাইদের। মেয়েদের সুবিধার জন্য মেডিক্যাল স্কুল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল ডাফরিন ফান্ড। কিন্ত ভারতে ডাফরিন ফান্ড প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই মেয়েরা মেডিক্যাল পড়তে উৎসাহী হয়েছিল, যদিও মেয়েদের চিকিৎসা জগতে পা রাখার ক্ষেত্রে বিস্তর বাধা এসেছিল। মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল অনেক দেরিতে। ঊনিশ শতকের পাশ্চাত্যেও চিকিৎসাবিদ্যার জগতে মেয়েরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হন। ইউরোপ বা

আমেরিকা কোথাওই মেয়েদের আন্তর্জাতিক চিকিৎসার পেশাতে আসার বিষয়টিকে দারুণ ভাবে উৎসাহিত করা হয়নি। ভারতেও অনেক বাধা ছিল। ভারতীয় মেয়েদের চিকিৎসার জগতে পা রাখার প্রয়াস শুরু হয় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। সত্তরের দশকেই শুরু হয় এই প্রয়াস, যদিও সাফল্য আসতে লেগে যায় আর একটি দশক। ভারতীয় মহিলা রোগীদের পাশ্চাত্য চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল মিশনারিরা বিদেশ থেকে মহিলা চিকিৎসক নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭০ সালে ভারতে আসেন ক্লারা সোয়াইন (Clara Swain)। চোদ্দোটি ভারতীয় অনাথ মেয়েকে নার্সিং-এর কাজ শেখান তিনি। এরপর আসেন সারা সি. ওয়ার্ড (Sara C. Ward)।[৭] ভারতীয় মেয়েদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য ১৮৮৫ সালে গড়ে ওঠে ‘ডাফরিন ফান্ড’। ভাইসরয়-পত্নী এবং অন্য আমলাদের পত্নীরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগ প্রধানত গৃহীত হয় ব্রিটেনের মহিলা মেডিক্যাল আন্দোলনের তিন পথিকৃৎ ফ্রান্সেস হোগান (Frances Hoggan), মেরি শেরলিব (Mary Scharlieb) ও এলিজাবেথ বেইলবি (Elizabeth Bielby)-র উদ্যোগে।[৮] তবে ভারতেও অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন তহবিলকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে।[৯] বাংলায় সত্তরের দশকে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহে মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা পঠন নিয়ে ভাবনা শুরু হয়। ইতিপূর্বে ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে অর্থবরাদ্দের কথা বলা হয় উনিশ শতকের ষাটের দশকে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছিল, তেমনই স্ত্রীশিক্ষার পদ্ধতি নিয়েও বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও বাইরে চলতে লাগল এই বিতর্ক। সব ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করার মানসিক সামর্থ্য মেয়েদের আছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠল। কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা চাইলেন মেয়েদের জন্য ‘স্ত্রীজনোচিত’ শিক্ষা যা তাদের সুগৃহিণী ও সুমাতা হিসেবে গড়ে তুলবে। অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল অংশটি চাইছিল পুরুষদের মতোই মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষা।[১০] কলকাতায় মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার বিষয়টি প্রগতিশীল ব্রাহ্ম মননকে নাড়া দেয়। ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ও চন্দ্রমুখী বসুর মহিলা গ্র্যাজুয়েট হিসেবে সাফল্য লাভ নারীশিক্ষার ইতিহাসে ঐতিহাসিক জলবিভাজিকা হয়ে থাকে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি মেয়েদের ব্যঙ্গ করেছিলেন তাঁর কবিতায়—

> ঐ যায় ঐ যায় বাঙালির মেয়ে
> খেয়ে যায়, নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে।[১১]

সেই হেমচন্দ্র বাঙালি মেয়ের সাফল্যে উদ্ভাসিত হয়ে লিখলেন—

> হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
> শুনও চন্দ্রমুখী, কৌমুদীর মালা
> তোমাদের অগ্রগামী আমি একজন
> এই বেলা ও উপাধি করেছি ধারণ।
> যে ধিক্কারে লিখিয়াছি বাঙালির মেয়ে
> তারি মত সুখ আজি তোমাদোঁহে পেয়ে।[১২]

ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে কলকাতা সমাজের এক মান্যগণ্য ব্যক্তি বাবু নীলকমল মিত্র দৌহিত্রী বিরাজমোহিনীকে মেডিক্যাল পড়াবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। তাঁর আবেদনপত্রে তিনি এও জানান যে তাঁর দৌহিত্রী পর্দার ঘেরাটোপে ক্লাস করবে এবং প্রতিদিন কলেজে উপস্থিত থাকা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। শবব্যবচ্ছেদের সময় তার স্বামী বা বা স্বয়ং নীলকমল মিত্রকে সেখানে উপস্থিত

থাকতে দিতে হবে।[১৩] যদিও এই প্রস্তাব সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা হয়নি, তবুও মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণের পথে সামাজিক বাধার বিষয় এই চিঠিতে স্পষ্ট ছিল। ভারতীয় মহিলারা চিকিৎসাজগতে পা না রাখলে ভারতীয় মহিলারা চিকিৎসার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন এমন ধারণা ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছিল। সংবাদপত্রগুলিও জনমত গঠনে সাহায্য করছিল। ১৮৭৬ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর রিচার্ড টেম্পলের উৎসাহ সত্ত্বেও মেয়েদের মেডিক্যাল শিক্ষার বিষয়টি বাস্তবায়িত হতে সময় নিচ্ছিল। সত্তরের দশকে মেয়েদের মেডিক্যাল পড়ার ইচ্ছে পূর্ণরূপ পায়নি। কিন্তু মেয়েদের এই লড়াইকে থামিয়ে রাখা যায়নি। এই দশকেই মেয়েরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার আবেদন রাখেন। ১৮৭৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মতি দেয়। ব্রাহ্ম নেতাদের আগ্রহে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার আবেদন করেন দুর্গামোহন দাশের মেয়ে সরলা ও ব্রজকিশোর বসুর মেয়ে কাদম্বিনী। ১৮৮২ সালে অবলা বসু ও অ্যালেন ডি. আব্রু শিক্ষাদপ্তরের কাছে মেডিক্যাল পড়ার আবেদন জানান। ওই বছর ৫ই মে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন মি. ক্রফট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং কাউন্সিলের কা কাছে ছাত্রী ভরতির বিষয়ে মতামত চান।[১৪] তিনি বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন এই বলে যে মহিলা চিকিৎসক তৈরি হলে মহিলা রোগীদের দুর্দশা অনেকখানি দূর হবে। তবে মেডিক্যাল কাউন্সিল সেই মুহূর্তে বাংলায় মহিলা চিকিৎসক তৈরির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। তারা মনে করেছিল যে নেহাতই যদি মহিলাদের চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে হয় তবে তাদের জন্য আলাদা কলেজ তৈরি করা যেতে পারে। এই তর্কবিতর্কের বেড়াজাল ডিঙিয়ে প্রথম যে বাঙালি মেয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে মাদ্রাজে চলে গেলেন তিনি অবলা দাশ। সঙ্গী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন অ্যালেন ডি. আব্রুকে। যদিও অবলা শেষ পর্যন্ত তাঁর পাঠ সমাপ্ত করেননি তবুও তিনিই প্রথম ভারতীয় মেয়ে যিনি মেডিক্যাল পড়তে গিয়েছিলেন। তবে বাঙালি সমাজের একটা অংশ যে বাঙালি মেয়ের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য বাইরে চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেনি তার প্রকাশ দেখা যায় পত্রপত্রিকায়। ১৮৮২ সালে বামাবোধিনী পত্রিকা লেখে, "অনেক কারণে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসক আবশ্যক। মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকেও শিক্ষাদান করা হইতেছে এ সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ধাত্রী প্রস্তুত হইয়া অনেক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু রীতিমত চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যাহাতে রমণীগণ উপযুক্ত চিকিৎসক হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক।"[১৫]

কাদম্বিনী বসু ১৮৮১ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেন। ব্রাহ্মসমাজের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল মেয়েদের মেডিক্যাল পড়ার ক্ষেত্রে। এই আগ্রহের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে যিনি কাদম্বিনীকে স্নাতক হবার জন্য উৎসাহিত করেন যাতে কাদম্বিনী মেডিক্যাল পড়তে পারে। কাদম্বিনীর আবেদনের পর দুবছর কেটে যায় তর্কবিতর্কে। ইতিমধ্যে মাদ্রাজ ও বোম্বাই মেডিক্যাল কলেজ মেডিক্যাল পঠনে মেয়েদের ভরতির প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল। ১৮৮৩ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর রিভার্স থম্পসন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পঠনের জন্য মেয়েদের ভরতি বিষয়ে উদ্যোগী হন।[১৬] এর একটা কারণ হয়তো বোম্বাই ও মাদ্রাজের তুলনায় বাংলার পিছিয়ে পড়ার ধারণা। যেখানে মেয়েদের পরিবারের সদস্যরা বাধা দিচ্ছেন না, সেখানে মেডিক্যাল কাউন্সিল বাধা সৃষ্টি করে সামাজিক রক্ষণশীলতার পরিচয় দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৩ সালের জুন মাসে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী ভরতির বিষয়ে ইতিবাচক প্রস্তাব নেওয়া হয়।

মেডিক্যাল কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী প্রথম মেডিক্যাল স্নাতক হতে পারেননি। সম্ভবত অধ্যাপক আর. সি. চন্দ্রের বিরূপতার কারণে একটি পত্রে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন তিনি। তবে ১৮৮৭ সালের সমাবর্তনে তিনি দারুণভাবে প্রশংসিত হন। বলা হয়, ‘Another movement on the side of progress is the noble organisation set on foot by the greatest lady in the land, to bring female medical aid within reach of the women of India’.[১৭] ১৮৮৫ সাল থেকেই নিয়মিত ভাবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী নেওয়া শুরু হয়। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ছিল মহান সেবাব্রতের আদর্শ। মেয়েদের চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারে অনেক বাধা থাকলেও দেশীয় মননে উৎসাহের অভাব ছিল না কাশিমবাজারের মহারানি স্বর্ণময়ী মেয়েদের আলাদা মেডিক্যাল কলেজ খোলার জন্য আট লক্ষ টাকা দান করতে আগ্রহী ছিলেন।[১৮] মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীদের থাকার জন্য ছাত্রীনিবাস নির্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি দান করেন দেড় লক্ষ টাকা। ১৮৮৭ সালে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে ভার্নাকুলার ক্লাসে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল এ মেয়েদের ভরতি করা হোক যাতে তারা গ্রামে গিয়ে চিকিৎসার উন্নতি ঘটাতে পারে। ১৮৮৮ সালে পনেরো জন ছাত্রী নিয়ে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভার্নাকুলার ক্লাস আরম্ভ হয়।[১৯] যদিও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করার আভিজাত্য সেখানে ছিল না, তবুও পেশাগত জগতে নানা বাধার মধ্যেও মেয়েদের প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য ছিল।

হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯২৩-২৪-এর সরকারি প্রতিবেদনে ছাত্রসংখ্যার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ১৯২৩ সালের ১ এপ্রিলের হিসেব অনুজায়ী ২৫ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী ক্লাস করছে। এই ৪ জন ছাত্রী সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “The standard of preliminary education of the newly admitted female students was, as usual, inferior to that of male students, but steady improvement is noted in this respect. Out of four, one was a passed senior Cambridge student and one a Matriculate.”[২০] এখানে ‘As usual’ কথাটি লক্ষণীয়। মেডিক্যালের ছাত্রীরা ছাত্রদের থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে। এর আগে ১৯২১ সালে ভরতির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ১৫৮ জন ছাত্র ও ৩ জন ছাত্রী ভরতি হয়েছে। ১৯২২ সালে ভরতি হয়েছে ১৮৬ জন ছাত্র ও ৮ জন ছাত্রী। ১৯২৩ সালে ভরতি হয়েছে ১৬৭ জন ছাত্র ও ৪ জন ছাত্রী। যতজন ভরতি হত সকলেই ক্লাসে থাকত না হয়তো শেষ পর্যন্ত। ১৯২১ সালে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ৫ জন ছাত্রীর ভরতি হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে ১৪৪ জন ছাত্রের সঙ্গে। ১৯২২ সালে ভরতি হচ্ছে ৬ জন মেয়ে, ১৯২৩ সালে ৪ জন।[২১] হাসপাতালের অধ্যক্ষের প্রতিবেদনে তাদের কয়েকজনের হাসপাতালে নিয়োগের কথা জানা যাচ্ছে।

নাম	পাস	নিয়োগ
মিস ব্রজবালা বিশ্বাস	১৯২১	লোকাল বোর্ড, সিলেট
মিস প্রেমলতা সরকার	১৯২১	মজফফরপুর
কমলা সুন্দরী রায়	১৯২১	মেটারনিটি হাসপাতাল, ঢাকা ম্যুনিসিপ্যালিটি
কিরণময়ী সরকার	১৯২৪	নোয়াখালি

সুপারিন্টেন্ডেন্ট এম ম্যাকেঞ্জি, রিপোর্ট ৫/৯/ ১৯২৪[২২]

১৯৩২-৩৩-এর সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায় দশ বছরে কতটা বাড়ল ছাত্রীর সংখ্যা মেডিক্যাল কলেজগুলিতে। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ১৯৩২-এ ৯২ জন ছাত্র ও ৯ জন ছাত্রী ভরতি হয়। ১৯৩৩-এ

ছাত্রসংখ্যা হয় ১২৬, ছাত্রী ১০ জন। ১৯৩২-এ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ১০৭ জন ছাত্র ও ৬ জন ছাত্রী ভরতি হয়। ১৯৩৩-এ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা ভরতির ক্ষেত্রে একই থাকে। লিটন মেডিক্যাল স্কুল, রোনাল্ডশয় মেডিক্যাল স্কুল, বর্ধমান বা বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলে এই সময় কোনো ছাত্রীর ভরতির কথা জানা যাচ্ছে না। জাতীয় আয়ুর্বীবিদ্যালয় বা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল কলকাতায় ১৯৩২-এ ২৬৫ জন ছাত্রের সঙ্গে ১ জন ছাত্রী ভরতি হয়েছিল।[২৩]

উপরের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় তিরিশের দশকেও বহুসংখ্যক মেয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে আসেনি। তখনও বাঙালি সমাজে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোর ক্ষেত্রে দ্বিধা ছিল। নিয়োগের ক্ষেত্রেও মেয়েদের অসুবিধেয় পড়তে হত কাদম্বিনীর সময় থেকেই। পুরুষ ডাক্তাররাও যে মহিলা সহকর্মীদের সবসময় সাদরে গ্রহণ করেছিল তেমনও নয়। অনেক মেয়ে পরবর্তীকালে কাজও ছেড়ে দিয়েছিলেন।[২৪] Geraldine Forbes লেখেন, “Campbell’s women graduates found positions easily, were well paid, and often had long and productive careers, but their professional lives were not easy. While those who opposed opening Campbell to women, claiming there would be no demand for this education or for lady doctors, were proved wrong, other difficulties appeared. Sexual harassment, from doctors and other men, was a fact of life.”[২৫] ক্যাম্বেল থেকে পাস করা মহিলারা সহজে ভাল বেতনের চাকরি পেলেও পেশাগত জীবনে বহু অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিল। মহিলা চিকিৎসকের কোন চাহিদা নেই বলে যারা ক্যাম্বেলের দরজা মেয়েদের জন্য খুলতে চায়নি তারা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল অন্য জায়গায়। যৌন হেনস্থা যা এসেছিল পুরুষ চিকিৎসক ও অন্যান্য পুরুষের থেকে তা অনেক মহিলা চিকিৎসকের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পাওয়া যাচ্ছে মালদা ইংলিশ বাজার হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক প্রমীলা রায়ের কথা যিনি একজন জমিদারের হাতে যৌন হেনস্থার কারণে চাকরি ছেড়েছিলেন। পাবনাতে মহিলা ডাক্তারকে পালকিবাহকেরা বলত দাই এবং তাঁকে রোগী দেখতে নিয়ে যেতে অস্বীকার করত। পরিবহণের অভাবে তিনি বহু সময় মহিলা রোগীদের দেখতে তাদের বাড়িতে যেতে পারতেন না।[২৬] মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী হিসেবে চতুর্থ মহিলা বাঙালি চিকিৎসক যামিনী সেন বিদেশ থেকে ফিরে সরকারি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কামিনী রায় তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে সমান বা অধিকতর যোগ্যতা থাকলেও তিনি কর্মজীবনে বারবার অবিচারের শিকার হয়েছিলেন। যামিনী বহুবার সরকারি চাকরি ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন। অনেকেই পড়া শেষ করেননি। পড়া শেষ করে চাকরি করতে গেলেও অনেকেই চাকরি ছেড়েছিলেন।[২৭]

David Arnold ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য পরিসেবার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ভারতীয় ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য সর্বদা রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে, আপামর জনসাধারণের প্রয়োজনকে নয়।[২৮] উদারনৈতিক আদর্শ ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সমন্বয়ে প্রাধান্য পেয়েছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। গুরুত্ব পেয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে জড়িত শাসকের কর্তব্যের ধারণাটি। গুরুত্ব পাচ্ছিল প্রাতিষ্ঠানিক দাতব্যের বিষয়টি। সেখানে মহিলাদের স্বাস্থ্য বিষয়টি থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দেশীয় অনগ্রসরতার চিত্রটিকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল মহিলাদের বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে দেশীয় বাধা কথাটির উপর জোর দিয়ে। কিন্তু নবমধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে মননের পরিবর্তন মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার দরজা একটু একটু করে খুলে দিচ্ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মেয়েদের অন্তরের তাগিদ যা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের

কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে যে লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছেছিলেন সেখানেও তাঁদের সীমা বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই ছিল, যে সীমারেখা আজও বিদ্যমান। তাই আজও শল্যচিকিৎসক বা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞর প্রয়োজন হলে আমরা পুরুষ চিকিৎসকেরই সন্ধান করি। তবুও নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে মহিলা চিকিৎসকেরা যে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছেন তা বারংবার ঊনবিংশ-বিংশ শতকের ঔপনিবেশিক সময়কালকে মনে করায়।

তথ্যসূত্র:

1. বামাবোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১২৯৩ (১৮৮৬)।
2. Borthwick, Meridith, The Changing Role of Women in Bengal: 1849-1905, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1984, p.321.
3. Bala, Poonam, ed., Contesting Colonial Authority: Medicine and Indigenous Responses in Nineteenth and Twentieth Century India, Primus Book, Delhi, 2016, p.2.
4. নাথ, ডাঃ শঙ্করকুমার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪ পৃ. ৫৮-৫৯।
5. Guha, Supriya, ‘The Best Swadeshi: Reproductive Health in Bengal, 1840-1940’ in Sara Hodges ed. Reproductive Health in India: History, Politics, Controversies, Orient Longman, New Delhi, 2006. P. 5.
6. নাথ, ডাঃ শঙ্করকুমার, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, পৃ. ১৪৯।
7. Forbes, Geraldine, Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography, Chronicle Books, New Delhi, 2005, p.109, 185.
8. Sehrawat, Samiksha, Colonial Medical Care in North India: Gender, State and Society C1840-1920, Oxford University Press, New Delhi, 2013, p.104.
9. ibid, p.104.
10. বসু, স্বপন, সম্পাদিত, উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।
11. দত্ত রায়, মালা, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৬৫।
12. দত্ত রায়, মালা, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৬৬।
13. দেব, চিত্রা, মহিলা ডাক্তার ভিন গ্রহের বাসিন্দা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৪।
14. Mukherjee, Sujata, Gender, Medicine and Society in Colonial India, Oxford University Press, New Delhi, 2017, p. 65.
15. বামাবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।
16. Proceedings of the Leutinant Governor of Bengal, General Department, Education, and July 1883, ‘Admission of Female Students into the Medical College’, file 88-1/8.
17. দেব, চিত্রা, মহিলা ডাক্তার ভিন গ্রহের বাসিন্দা, পৃ. ৯৪।
18. Proceedings of the Leutinant Governor of Bengal, General Department, Education, March, 1886, file 31.8/9.

19. Proceedings of the Leutinant Governor of Bengal, General Department, Education, April, 1886.
20. Annual Reports of the Medical Schools in Bengal, 1923-24.
21. Annual Reports of the Medical Schools in Bengal, 1923-24.
22. M Makenzi, Superintendent’s Report on 5.9.1924.
23. Annual Reports of the Medical Schools in Bengal, 1932-33.
24. দেব, চিত্রা, মহিলা ডাক্তার ভিন গ্রহের বাসিন্দা, পৃ. ১৭২।
25. Forbes, Geraldine, Women in Colonial India, pp. 109,131.
26. The Seventeenth Annual Report of the Bengal Branch of the National Association for Supplying Medical Aid to the Women of India, 1902, p. 14.
27. চিত্রা, মহিলা ডাক্তার ভিন গ্রহের বাসিন্দা, পৃ. ১৩৪-১৩৫।
28. Forbes, Geraldine, Women in Colonial India, Essays on Politics, Medicine, And Historiography, Chronicle Books, New Delhi, 2005, p. 80.